আগমনী

প্রব্রাজিকা সত্যময়প্রাণা

আকাশ আবার নীল। বৃষ্টির জলে ধোয়া দশদিক। রুক্ষ বাতাস আর নেই। সে সিক্ত হয়ে শিউলির গন্ধ, কেয়ার গন্ধ বয়ে আনছে বহু দূর থেকে। নদীর ধারের কাশফুলের বন কাকে যেন মাথা নেড়ে ব্যজন করেই চলেছে। গাছের পাতারা ধারাজলে স্নান করে নিজের নিজের রং ফিরে পেয়েছে। কোনও সবুজের সঙ্গেই কোনও সবুজের মিল নেই। যে যার নিজের নিজের রঙে রেঙে রয়েছে। মাঠে মাঠে সবুজ ধানের মাথা হেলিয়ে দুলিয়ে নৃত্য দেখে মনে পড়ল ''ছেড়ে জল যেন স্থলে তরঙ্গ গড়ায়।'' সে-তরঙ্গের সঙ্গে তাল মিলিয়ে গাইছে দোয়েল, শ্যামা, ফিঙে, নীলকণ্ঠ, আরও কত পাখি, তাদের মধুর গান। চারদিকে আলোর আভা, খুশির আমেজ, আনন্দের স্পর্শ। সর্বত্রই যেন ভাল-ভাল একটা ভাব—ভাল দৃশ্য, ভাল শব্দ, ভাল স্পর্শ, ভাল গন্ধ, ভাল আস্বাদন—এই তো মা জানিয়ে দিচ্ছেন তাঁর আগমনী বার্তা।

সেই কবেকার কথা! কী ভীষণ তপস্যায় সোনার অঙ্গ কালি করে আমাদের গৌরী মনের মতো ঘর পেয়ে দুচোখভরা স্বপ্ন নিয়ে কৈলাসে সংসার করতে চলে গেছেন। ভক্ত একটিবার কৌতূহলী চোখে তাঁদের অন্দরে উঁকি দিলেন। কী দেখলেন?

''তুষারধবল হ্রদে নীলিম নলিনী।
হর-হৃদি মাঝে আমার শ্যামা মা জননী॥
রূপ সে তিমিররাশি, অথচ তিমির নাশি।
উজলিছে ত্রিভুবন জিনি সৌদামিনী॥''

—তুষারশুভ্র মহাদেবের হৃদয়মাঝে নীলবরণী শ্যামা যেন তুষারধবল হ্রদে ফোটা একটি 'নীলিম নলিনী'! তিমিররাশি দিয়েই সে-রূপ গড়া কিন্তু রূপের বিদ্যুৎ-বিভায় দশদিক আলো করাই তার কাজ।

আনন্দের বানে ছলাৎছল ভাসছে কৈলাস। সে-আনন্দঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে ধ্যানস্থ ভক্তের মানস সরোবরের তটে। শ্মশানচারী শিবের ঘরে এখন শিবানী ঘরনি। তাই ভাঙ খেয়ে সারাদিন শ্মশানে-মশানে ঘুরে না বেড়িয়ে সাত সকাল থেকে কী খাই-কী খাই চিন্তায় বিভোর ভোলা। স্বভাবতই ডাক পড়ে শঙ্করীর। বিরাট ফর্দ ধরান শঙ্কর—

''নিমে সিমে বেগুনে রান্ধিয়া দিবে তিতো।
বাটিয়া কাঁঠাল বিচি সার গোটা দশ
ফুলবড়ি দিবে তাহে আর আদারস।''
তালিকা দীর্ঘ।

শুধু কি সেদিন? আজও সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলছে। আজও সমাধিমগ্ন মহেশ্বর কখনও

সমাধিতে বুঁদ হয়ে থাকেন, কখনও বা জগতকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদ অনুভব করে তালিম দেন ভবিষ্যৎ জগৎ-পরিচালকদের। সে-বনস্পতিচারারা মহেশ্বরের সঙ্গে রাতে থাকবেন, খাবেন, আনন্দ করবেন। তাই শিবানীর ওপর আদেশ জারি হয় মোটা মোটা রুটি আর চাপ চাপ ছোলার ডাল রাঁধার। সদাহাস্যমুখ জননীর কোনওদিনই কিছুতে বেজার নেই। বেজার থাকবেই বা কেন? তিনি তো আর সংসারবিবাগী সন্ন্যাসী-আরাধ্য তাঁর পতিদেবতাটিকে সংসারপথে টানতে আসেননি, এসেছেন সাহায্য করতে। তাই সারাদিন খেটে খেটে হাড় কালি হয়, আর ওদিকে মহেশ্বরের ঘরে আনন্দের হাট-বাজার। যদিও দুমাসে একবার তিনি মহেশ্বরের দর্শন পান কি না পান! তবুও অনুভব করেন, হৃদয়ে আনন্দের পূর্ণঘট বসানো আছে ।

এইভাবেই কাটে শিবানীর সংসার। গিরিপুরে কিন্তু মায়ের মন কিছুতেই বাগ মানে না। দুশ্চিন্তায় উদ্বেগে আহারনিদ্রা বন্ধ হয়ে যায় মায়ের। দুশ্চিন্তা হবে না-ই বা কেন? বছর ঘুরতে চলল কন্যা চলে গেছেন। তবু যদি জামাতাদেবতাটি মনের মতো হতেন! লোকমুখে কত কথাই না মায়ের কানে আসে। একে উপার্জনে অক্ষম বিত্তহীন বৃদ্ধ, তায় নেশায় মাতাল হয়ে ভূতপ্রেত সঙ্গে শ্মশানে মশানে রাত্রিবাস, তার ওপর উপরি পাওনা সতিনের জ্বালা। —কোন মা স্থির থাকবেন! স্বভাবতই রাতের ঘুম গেছে। যদিও বা একটু চোখ বুজে আসে অমনি দেখেন উমাকে। তাই গিরিরাজকে জানান—

''নিশিতে যেমন ভেবে উমাধন,
অনেক আয়াসে মুদেছি নয়ন,
অমনি নয়নে করি দরশন—
শিয়রে বসিয়া যেন মা আমার।
বাছার নাই সে বরণ, নাই আভরণ,
হেমাঙ্গী হইয়াছে কালীর বরণ;
হেরে তার আকার চিনে উঠা ভার,
সে উমা আমার উমা নাই হে আর।''

এসব ভেবে ভেবে মায়ের চিত্ত বিকল। তার ওপর আবার পাড়াপ্রতিবেশীরা আছেন, যাঁরা শোনেন এক, বলেন আর এক—শেষে পাঁচকান হয়ে যখন সংবাদটি মায়ের কানে পৌঁছয় তখন তিল থেকে তাল—জামাতা রাতে বাড়ি ফেরেন না, ভাঙ খেয়ে শ্মশানেই নিদ্রা যান, কত সময় বস্ত্রও তাঁর অঙ্গে থাকে না। এ পর্যন্ত তবু ঠিক ছিল; এখন শুনছেন, অর্ধাঙ্গিনী শিবানীও পতিদেবতার যোগ্য ভার্যা হওয়ার সাধনায় রত হয়েছেন।—

''শিবের স্বভাব দেখিয়ে, ভেবে ভেবে কালী হয়ে...
সেজে বিপরীত সাজ, বিরাজে ত্যাজিয়ে লাজ,
কি শুনি দারুণ কাজ, মাতিয়াছে সুরাপানে॥''

—বছর না ঘুরতেই উমাও ঘর ছেড়েছেন, নিজের বেশভূষা ছেড়ে বিপরীত বেশভূষা ধরেছেন, স্বামীর সঙ্গে তিনিও এখন সুরাপানে মত্ত হয়েছেন।

এ তো মহা মুশকিল, মা দেখেন মেয়ের দুঃখের অন্ত নেই; আর ভক্তচক্ষু দর্শন করেন আশ্চর্য রাজযোটক! কার যে দৃষ্টি সঠিক কে বলবে!

দৃষ্টির কথা থাক।

মা আর ধৈর্য রাখতে পারেন না। গিরিরাজকে বার বার অনুরোধ করেন একটিবার মেয়েকে দেখে আসতে। গিরিরাজ মুখে কোনও কথাটি না বলে, চাদর কাঁধে ফেলে একটু ঘরের বার হন। চারদিক ঘুরে ঘারে এসে স্ত্রীকে মিথ্যা প্রবোধ দেন—''শরতে আসবেন পুরেতে''। কিন্তু পিতাও ধৈর্য হারিয়ে অবশেষে একদিন সত্যিই কন্যাকে নিয়ে আসেন।

পথশ্রমে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে বছরশেষে আশ্বিনে উমা পিতৃগৃহে এলেন। প্রথমে খানিক আনন্দ-উৎসব। তারপরে ক্ষুধার্ত মেয়ের মুখে অতি যতনে জননী তুলে দেন ক্ষীর-সর।

খেয়ে বসে একটু সুস্থির হয়ে একান্তে কন্যা মাকে জানান আপন দুঃখের কথা—

''কৈলাসেতে বলে আমায় সবাই,

তোর কি মা নাই? তোর কি মা নাই?
অমনি মরমে মরে যাই।
তাদের বলি আমার পিতে
এসেছিলেন নিতে
শিবের দোষ দিয়ে কাঁদি বিরলে।"

শিবানীর প্রেমসরোবরে দিবানিশি ফুটে থাকে একটিই শ্বেত উৎপল। শিবানীর ধ্যান-জ্ঞান-ঐশ্বর্য —"নিত্য সত্য পূর্ণ জ্ঞানে পূর্ণ মহেশ্বর।" শিবানীর হৃদয়দেবতা হয়ে মন প্রাণ ব্যাপ্ত করে বসে থাকেন যিনি, তাঁকেই কিনা মিথ্যা দোষ দেন পাড়াপড়শির গঞ্জনা থেকে বাঁচতে! তাই মেনকা জামাতাদেবতাটির কোনও প্রসঙ্গ উত্থাপনের আগেই কন্যা উপযাচক হয়েই শোনাতে থাকেন :

"কে বলে দরিদ্র হর, রতনে খচিত ঘর মা,
জিনি কত সুধাকর শত দিনমণি।
বিবাহ অবধি আর কে দেখেছে অন্ধকার,
কে জানে কখন দিবা কখন রজনী।"

কন্যার মুখে এমন কথা শুনে মা তো আনন্দে আত্মহারা। কন্যার এ-হেন সুখের কথা শুনে মেনকা আর স্থির থাকতে পারেন না। একটু উচ্চৈঃস্বরে পড়শির কানে পৌঁছয় এমনভাবে বলতে থাকেন —গৌরীকে আমার বিবাহ করবার পর শিব শ্মশান ছেড়ে কৈলাসে নতুন হর্ম্য গড়িয়ে বাস করছেন। দিগ্‌বসন ত্যাগ করে এখন সুন্দর সুন্দর বস্ত্র পরিধান করেন বলে শুনছি, ভস্ম ত্যাগ করে এখন নাকি অঙ্গে চন্দন মাখেন—এমন আরও কত কী!

"মঙ্গলার মুখে কি মঙ্গল শুনতে পাই—
উমা অন্নপূর্ণা হয়েছেন কাশীতে,
রাজরাজেশ্বর হয়েছেন জামাই।...
যারে পাগল পাগল বলে, বিবাহের কালে,
সকলে দিলে ধিক্কার;
এখন সেই পাগলের সব, অতুল বৈভব,
কুবের ভাণ্ডারী তার।"

মায়ের এমন নানা কথা শুনতে শুনতে ক্লান্ত উমা কখন ঘুমিয়ে পড়েন। পরের দিন আদর করে ডেকে তোলেন জননী—

"উঠ মা সর্বমঙ্গলে প্রভাত হল যামিনী।
পথ-শ্রান্তে কত নিদ্রা যাও মা বিধুবদনী॥
কর্পূরবাসিত বারি, মুখ প্রক্ষালন করি,
খাও কিছু প্রাণ-কুমারী করি আয়োজন॥"

যত্নের আয়োজন করতে করতে নিমেষে তিনদিন কেটে যায়। পিতৃগৃহে পিতা-মাতা যতই প্রাণের পুতলীকে আর কটাদিন থেকে যেতে অনুরোধ করুন না কেন, মেয়ে কিন্তু যেন কার আকর্ষণ অনুভব করে উন্মনা। মায়ের চোখকে তো আর ফাঁকি দেওয়া যায় না! কিন্তু কন্যাকে বিশেষ কিছুই বলতে না পেরে পাড়াপ্রতিবেশীর কাছে মনের দুঃখ লাঘবের আশায় মেনকা জানান—

"কাল এসে, আজ উমা আমার যেতে চায়!
তোমরা বল গো, কি করি মা,
আমি কোন প্রাণে উমাধনে মা হয়ে দিব বিদায়!"

আমরা বলি কী, গিরিরানি, বিদায় দেওয়ার দরকারটাই বা কী? তার চেয়ে বরং আমাদের চারপাশে ছড়ানো-ছিটোনো মনটাকে কুড়িয়ে এনে আপনার কন্যা তথা আমাদের জননীর শ্রীচরণদুটি দুহাতে জড়িয়ে ধরে তার ওপর মাথা রেখে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম নিবেদন করে প্রার্থনা করি—মা, সব সম্পদে, সব বিদ্যায়, সব ধর্মে, সব কল্যাণের আধার তোমার দুর্গা নামটি কৃপা করে আমাদের হৃদয়-মনে প্রতিষ্ঠিত করে দাও। সেই হৃদয়-মনে নিত্য ফুল ফুটে ঝরে পড়ুক তোমার রাঙা চরণদুটিতে, আর নিত্য নৈবেদ্য নিবেদিত হোক তোমার সামনে।

জননী, আপনমনে তোমার চরণধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। শিশিরভেজা ঘাসের মাথায় তোমার টুকটুকে আলতো চরণদুটি ফেলে তুমি আসছ তো মা? তোমার এই আবাহনই চিরসত্য হোক। বিসর্জন নয়।